শেষের পাতা

বৃহস্পতিবার
২৮ নভেম্বর ২০২৪
১৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

দৈনিক
বায়ান্নর আলো
প্রতিদিন নতুন দিন

নাগরিকের অসন্তোষ দূরীকরণে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা

রুপাল মিয়া

'অভিযোগ' শব্দটির সঙ্গে পরিচিত নন এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। মূলত শারীরিক, মানসিক, আর্থিক ক্ষতি হলে কিংবা কোনো অনিয়ম হলে মানুষ অভিযোগ করে থাকেন। অভিযোগের লক্ষ্য হলো অভিযুক্ত ব্যক্তির শাস্তি প্রদান। তবে অভিযোগ করলেই অভিযুক্তি ব্যক্তি শাস্তি পাবেন এমনটা নয়। কারণ অভিযোগ অনেক সময় ভিত্তিহীন হিসাবে প্রমাণিত হয়। পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মানুষকে বিভিন্ন অভিযোগের মুখোমুখি হতে হয়। তাই ক্ষেত্রবিশেষে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় ভিন্নতা রয়েছে।

রাষ্ট্র একটি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের সেবার মান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন জনসেবা প্রদানকারী দপ্তরসমূহের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা। এতদুদ্দেশ্যে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (Grievance Redress System-GRS) একটি কার্যকর পদ্ধতি হিসাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং যে কোনো প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ও কার্যকারিতা পরিমাপের অন্যতম সূচক হিসাবে এটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২১ (২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, 'সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য'। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিশ্রুত সেবা, সেবা প্রদান পদ্ধতি এবং সেবা ও পণ্যের মান সম্পর্কে নাগরিকের অসন্তুষ্টি বা সংক্ষুব্ধতা দূর করার জন্য অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বপ্রণোদিতভাবে সেবা প্রদানের মনোবৃত্তি বিকাশে এই অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশের অনেকেই জানেন না সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি কিভাবে তার অভিযোগ জানাবেন।

সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে সংক্ষুব্ধ যেকোনো ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে উপস্থিত হয়ে অথবা ডাকযোগে, ইমেইলে, ই-ফাইলে অথবা কল সেন্টারের মাধ্যমে কিংবা অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা-সংক্রান্ত ওয়েবসাইট (www.grs.gov.bd)-এর মাধ্যমে অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন। সকল সরকারি দপ্তরে সেবা-সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ এবং তা প্রতিকারের জন্য একজন অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) দায়িত্ব পালন করেন।

ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় একজন নাগরিক নিবন্ধনপূর্বক নাগরিক হিসাবে প্রাপ্য সেবা-সংশ্লিষ্ট অভিযোগ করতে পারেন অথবা ব্যক্তিগত তথ্য গোপন রেখে অজ্ঞাতনামা হিসাবে অভিযোগ করতে পারেন। অজ্ঞাতনামা হিসাবে অভিযোগ দায়ের করলে অভিযোগটির ওপর কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে কিনা, সে বিষয়ে অভিযোগের ধরন/গুরুত্ব অনুযায়ী অনিক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। তবে ধর্মীয়, আদালতে বিচারাধীন, তথ্য অধিকার, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে গৃহীত বিভাগীয় মামলা অথবা আইন বা বিধির আওতায় রিভিউ/আপিলের সুযোগ রয়েছে এরূপ বিষয়-সংশ্লিষ্ট অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হবে না। দাখিলকৃত অভিযোগটি নিষ্পত্তি হয়ে গেলে অভিযোগকারীকে এসএমএস ও ইমেইল এর মাধ্যমে জানানো হয়। সাধারণভাবে অভিযোগ নিষ্পত্তির সর্বোচ্চ সময়সীমা ৩০ কার্যদিবস। তদন্তের বিষয় গৃহীত হলে অতিরিক্ত ১০ কার্যদিবস সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়। অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থায় অভিযোগকারী যদি সন্তুষ্ট না হয়ে থাকেন তবে, তিনি আপিল করতে পারেন। আপিল কর্মকর্তা হলেন অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তার ঊর্ধ্বতন অফিসের অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা। আপিল কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার সময়সীমা ২০ কার্যদিবস। আপিল করার পর আপিল কর্মকর্তার সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে অথবা সন্তুষ্ট না হয়ে থাকলে অভিযোগকারী পুনরায় আপিল করতে পারেন। পুনরায় আপিলের ক্ষেত্রে আপিলটি সরাসরি অভিযোগ ব্যবস্থপনা সেলের (মন্ত্রীপরষদ সচিবের তত্ত্বাবধানে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট সেল) নিকট প্রেরিত হবে। উল্লেখ্য যে, সেল কর্তৃক অভিযোগ নিষ্পত্তির সময়সীমা ৬০ কার্যদিবস এবং সেল কর্তৃক সুপারিশ প্রদানের পর মন্ত্রণালয়/বিভাগ তা ২০ কার্যদিবসে নিষ্পত্তি করবে। অভিযোগ নিষ্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে অথবা ডাকযোগে বা বাহকের মাধ্যমে ৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীকে অভিযোগের ফলাফল সম্পর্কে অবহিত করা হয়।

ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় যেকোনো নাগরিক যেকোনো সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি, সেবা সহজিকরণ, সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত বা মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করতে পারবেন।

কোনো অভিযোগকারী অভ্যাসগতভাবে অসত্য এবং কাউকে হয়রানি করার জন্য কিংবা অন্য কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে অভিযোগ দাখিল করেন মর্মে প্রমাণিত হলে অনিক-এর সুপারিশের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট আপিল কর্মকর্তা উক্ত অভিযোগকারীকে কালো তালিকাভুক্ত করতে পারবেন। এরূপ কালো তালিকাভুক্ত ব্যক্তির নিকট থেকে প্রাপ্ত কোনো অভিযোগ কর্তৃপক্ষ বিনা পদক্ষেপে খারিজ করতে পারবেন এবং পরবর্তী সময়ে ঐ ব্যক্তিকে কালোতালিকা হতে অব্যাহতি না দেওয়া পর্যন্ত আর কোনো অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন না। তাই প্রজাতন্ত্রের কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। অর্থাৎ অভিযোগের বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে অভিযোগ করাই শ্রেয়।

সেবাপ্রত্যাশীদের সেবা প্রদান করা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের কর্তব্য। সেবাপ্রত্যাশীদের অসন্তুষ্টি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রতিকার চাওয়া বা বক্তব্য প্রদানের ক্ষেত্রে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি কার্যকর পদক্ষেপ। তাই নাগরিকগণ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় নিজেদের যত সম্পৃক্ত করতে পারবেন প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের কর্তব্যে অবহেলার পথ তত রুদ্ধ হবে এবং মানসম্মত সেবা নিশ্চিত হবে। (লেখক : সহকারী তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুর।)

শেষের পাতা

দৈনিক
বায়ান্নর আলো
প্রতিদিন নতুন দিন

মঙ্গলবার
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪
০৯ আশ্বিন ১৪৩১

পলিথিন পরিহারে প্রয়োজন বিকল্প ব্যবহার সচেতনতা ও আইনের প্রয়োগ

মোঃ রুপাল মিয়া

মানুষ কোনো কিছুতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে, সেটার ভালো-মন্দের বিষয় খুব সহজে অনুভব করতে চান না। এজন্য বলা হয় মানুষ অভ্যাসের দাস। কিন্তু এই দাসত্ব যদি নিজের কিংবা অন্যের জন্য ক্ষতিকর হয়, তা বরণ করা নিতান্তই বোকামি। পলিথিনের ব্যবহার এমন একটি অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, যেটাকে মানুষ শুধু প্রয়োজনীয়তা মনে করছেন। এই পলিথিনের ব্যবহার পরিবেশের জন্য যে কতটা ভয়াবহ, তা মানুষ উপলব্ধি করতে পারছেন না। তাইতো বলা হয়- মানুষ তার ভুলটা বুঝতে পারেন, ভুলের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে। পলিথিন অত্যন্ত পরিচিত প্লাস্টিক। এটি অস্বচ্ছ ও নমনীয়। সহজে পচনশীল না হওয়ায়, পলিথিন আমাদের বিভিন্ন কাজে লাগলেও তা পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। ব্যবহৃত পলিথিনের পরিত্যক্ত অংশ দীর্ঘদিন অপরিবর্তিত ও অবিকৃত থেকে মাটি ও পানি দূষিত করে। আমাদের দেশে পলিথিন ব্যবহারের প্রবণতা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর মূল কারণ হলো পলিথিনের সহজলভ্যতা। এক সময় মানুষ কাপড়ের কিংবা পাটের ব্যাগ হাতে বাজারে যেতো। এর মানে এই নয় যে, সে সময় পলিথিনের ব্যবহার ছিল না। তখন পলিথিনের ব্যবহার ছিল সীমিত। বাংলাদেশে ১৯৮২ সাল থেকে বাণিজ্যিকভাবে পলিথিনের উৎপাদন শুরু হয়। পলিথিনের অতি ব্যবহারের কারণে ১৯৯৮ সালে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন শহরে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

বর্তমান মানুষ পলিথিনের ব্যবহারকে যতটা সুবিধাজনক মনে করে, কাপড়ের কিংবা পাটের ব্যাগ হাতে করে বাজারে যাওয়াকে ততটাই বিরক্তিকর মনে করে। বাজারে গিয়ে কোনো কিছু কিনলেই দোকানদার বিনামূল্যে পলিথিনের ব্যাগ দেন। এমনকি যতটা পণ্য কেনা হয়, দোকানদার ততটা পলিথিনের ব্যাগ দিতেও কার্পণ্য করেন না। অনেক সময় ক্রেতার প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ পণ্যভরা কয়েকটি পলিথিনের ব্যাগকে একটি বড়ো পলিথিনের ব্যাগে ভরে দেন। এমন সুবিধাকে কেউ কখনও এড়িয়ে চলতে চান না। কিন্তু কখনও কি ভেবে দেখেছি, এই পলিথিন আমাদের কতটা ক্ষতি করছে? উত্তরঃ না। কারণ আমরা সব সময় বর্তমান সুবিধার কথাই চিন্তা করি। এর ভবিষ্যৎ প্রভাবের বিষয়টি মাথায় নেই না।

পলিথিন এমন একটি পদার্থ যা মাটিতে মিশে যেতে সময় লাগে ২০০ থেকে ৪০০ বছর। প্রতিদিন কোনো না কোনো কারণে বাজার থেকে নিয়ে আসা পলিথিনগুলো কোথাও না কোথাও ফেলছি। পরিত্যক্ত পলিথিনগুলো মাটির উর্বরতা বা মাটির গুণাগুণ নষ্ট করছে। ড্রেনে জমা হয়ে পয়ঃনিষ্কাশনে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। ফেলে দেওয়া পলিথিন ব্যাগের একটি বিরাট অংশ কোনো না কোনোভাবে নদ-নদীতে গিয়ে পড়ছে। এরফলে নদ-নদী দূষিত হওয়ার পাশাপাশি তলদেশে পলিথিনের স্তর তৈরি হচ্ছে। এতে নদ-নদীর জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের সম্মুখীন হচ্ছে। আবার পলিথিন পোড়ালে এ থেকে উৎপন্ন কার্বন মনোক্সাইড বাতাস দূষিত করছে। তাই পলিথিন ব্যবহারের সাময়িক সুবিধা থাকলেও এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পরিবেশের উপর মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

মানুষের স্বাস্থ্যের উপর পলিথিনের ক্ষতিকর প্রভাবও কম নয়। গরম খাবার পলিথিনে নেওয়া হলে, প্লাস্টিকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা খাবারের সঙ্গে দ্রুত মিশে যায়। এতে স্বাস্থ্যের জন্য বড়ো ধরনের ঝুঁকি তৈরি হয়। পলিথিনের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে চর্মরোগ, ক্যানসারসহ আরও জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে পলিথিন ব্যাগকে চর্মরোগের এজেন্ট বলা হয়। পলিথিনে মাছ, মাংস ইত্যাদি মুড়িয়ে রাখলে কিছুক্ষণ পর এতে রেডিয়েশন তৈরি হয়। ফলে খাবার বিষাক্ত হয়ে ওঠে। পলিথিন রং করার জন্য ব্যবহৃত ক্যাডমিয়াম মানব শরীরের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

১৯৯৫ সালের পরিবেশ সংরক্ষণ আইনে ২০০২ সালে সংশোধনী এনে পলিথিনের উৎপাদন ও বাজারজাত নিষিদ্ধ করা হয়। এটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫-এর ৬(ক) ধারাটি সংযোজন করা হয়। এই আইনের ১৫ ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি নিষিদ্ধ পলিথিনসামগ্রী উৎপাদন, আমদানি বা বাজারজাত করেন, তাহলে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড হতে পারে। এমন শাস্তির বিধান থাকা সত্ত্বেও পলিথিনের ব্যবহার রোধ করা সম্ভব হয়নি।

মানুষের কাছে পলিথিনের ব্যবহার হচ্ছে ফাস্ট ফুডের মতো। ফাস্ট ফুড ক্ষতিকর তা সত্ত্বেও মানুষ যেমন গ্রহণ করেন, তেমনি পলিথিনের ক্ষতিকর প্রভাব থাকা সত্ত্বেও তা ব্যবহার করছেন। আইন দ্বারা ফাস্ট ফুড গ্রহণ রোধ সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সচেতনতাই একমাত্র উপায়। কিন্তু পলিথিনের ব্যবহার রোধে সচেতনতার পাশাপাশি আইনের যথাযথ প্রয়োগ জরুরি। তবে এটাও সত্য যে, এত প্রয়োজনীয় পণ্যটির বিকল্প উপায় বের না করে তা বন্ধ করলে জনগণ বিড়ম্বনার সম্মুখীন হবেন। আশার কথা বাংলাদেশি বিজ্ঞানী মোবারক আহমদ খান পাটজাত পলিথিন (বায়োডিগ্রেডেবল প্লাস্টিক) আবিষ্কার করেছেন। যা 'সোনালি ব্যাগ' নামে পরিচিত। পাট বাংলাদেশের একটি অর্থকরী ফসল। পাট ও পাটজাত পণ্য পচনশীল হওয়ায় তা পরিবেশবান্ধব। তাই পাটজাত পণ্যকে পলিথিনের বিকল্প হিসাবে ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হলে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে এমনটাই প্রত্যাশা।

(পিআইডি ফিচার)

লেখক : সহকারী তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুর

দৈনিক যুগের আলো
আমরা মানবতার পক্ষে
উত্তরাঞ্চলের সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিক
শনিবার ২৭ আশ্বিন ১৪৩১ ■ ১২ অক্টোবর ২০২৪

ওয়াদুদ হাসান বাঁধন

রংপুরের দেয়াল এখন আন্দোলনের রাঙা পোস্টার

অধিকার আদায়ে বাঙালি জাতির আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাস গর্বের। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, নব্বইয়ের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের মতো চব্বিশের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসের পাতায় যোগ করেছে আরেকটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

ইতিহাসে কোন কোন সময় এমন আসে যখন এক একটা মিনিটের ব্যাপ্তি, গভীরতা এবং ঘনত্ব শত বছরকে ছাড়িয়ে যায়। আমাদের জীবনে চব্বিশের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন সে রকম। এই আন্দোলনের মর্মবাণীর মোহন সুন্দর বজ্র নিনাদ যাদের বুকে বেজেছে, তারা ছাড়া অন্য কেউ এর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারবে না। জুলাইয়ের প্রথম থেকেই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ব্যানারে গোটা দেশের ছাত্ররা একত্রিত হতে থাকে। ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ অবরোধে প্রশাসনের অযাচিত শক্তি প্রয়োগ ও নির্বিকার গুলিবর্ষণ, এ আন্দোলনকে গণমানুষের আন্দোলনে পরিণত করে। দেশের বুদ্ধিজীবী, সুশীল সমাজ, শিল্পী-সাহিত্যিকসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ শিক্ষার্থীদের হত্যার বিচার ও বৈষম্যহীন দেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে রাজপথে নেমে আসে। তখন আন্দোলন পায় নতুন রূপ। সৃষ্টিশীল ছাত্র-জনতা মিছিল-অবরোধের আন্দোলনকে উঠিয়ে আনে গান, কবিতা আর দেয়ালচিত্রে। রংপুরের দেয়াল তখন হয়ে উঠে আন্দোলনের রাঙা পোস্টার। দেয়ালগুলোতে ছাত্র-জনতা তাদের ক্ষোভ, ঘৃণা আর দ্রোহের ভাষা ফুটিয়ে তোলে। 'এই শিকল পড়েই শিকল তোদের করবোরে বিকল' কিংবা 'দড়ি ধরে মারো টান, রাজা হবে খান খান' -এর মতো অসংখ্য স্লোগানে ভরে যায় রংপুরের দেয়াল। কোথাও শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ করে লিখেছে 'আমার খাও, আমার পরো, আমাকেই গুলি করো' আবার কোথাও লিখেছে 'তোমার কোটা তুমি নাও, আমার ভাইকে ফিরিয়ে দাও'। দেয়ালচিত্রগুলোতে শিক্ষার্থীরা তাদের স্বকীয়তার বর্ণনা দিয়েছে এভাবে 'জেনো ওহে! আমাদের রক্তে চারটি কণা; শ্বেত, লোহিত, অনুচক্রিকা সঙ্গে বারুদদানা' কখনো বা সতীর্থদের সাহস জোগাতে লিখেছে, 'বন্ধু তোমার ছাড়ো উদ্বেগ, সুতীক্ষ্ণ করো চিত্ত, বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি বুঝে নিক দুর্বৃত্ত'। আন্দোলনকে যে কতটা শৈল্পিকভাবে তুলে ধরা যায়, এই দেয়ালচিত্রগুলোই তার উদাহরণ। তবে আন্দোলন সফল হবার পর বদলে যায় দেয়ালের লিখন, ভাষা ও চিত্র। দেয়ালে নতুন করে ফুটিয়ে তোলা হয় দেশপ্রেম, সাম্য, ভ্রাতৃত্ববোধ আর নতুন দেশের স্বপ্ন। রংপুর চেকপোস্ট এলাকার দেয়ালগুলোতে শিক্ষার্থীরা লিখেছে 'সমুদ্রজুড়ে গর্জন, সবসময় আমারই থাক', 'গণতন্ত্র মূলমন্ত্র'; 'আমি একবার দেখি, বার বার দেখি, দেখি বাংলার মুখ'-এর মতো অনেক স্লোগান। রংপুর লালকুঠির মোড়ের দেয়ালগুলোতে লেখা রয়েছে 'ন্যায়কে ন্যায় বলি, অন্যায়কে না বলি', 'আর নয় অত্যাচার, দেশ হোক সংস্কার'। রংপুর ডিসির মোড় এলাকার দেয়ালে লেখা 'ধর্ম যার যার, দেশ সবার'। রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের দেয়ালে লেখা 'বিকল্প কে? তুমি, আমি, আমরা'; 'দুর্নীতির দিন শেষ, অধিকারের লড়াইয়ে বাংলাদেশ'-এর মতো অসংখ্য দেয়াল চিত্র। যেখানে শিল্প হয়ে উঠেছে নাগরিক প্রতিবাদ ও শপথের সম্মিলিত ভাষা।

আন্দোলনের প্রাপ্তির সাথে মাতৃভূমির সংকট-সম্ভাবনায় আপসহীন আত্মত্যাগকারী শহিদদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই। তাঁদের রেখে যাওয়া স্বপ্নকে পূর্ণতা দিতে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি বৈষম্যহীন ও বাসযোগ্য বাংলাদেশ তৈরিতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাই এই মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবীদের চেতনার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও বলতে চাই 'এসো রবিশঙ্করের সুরে সুরে মুমূর্ষু মানবতাকে গাই/ বিবেকের জং ধরা দরোজায় প্রবল করাঘাত করি/ অন্যায়ের বিপুল হিমালয় দেখে এসে ক্রুদ্ধ হই, সংগঠিত হই/ জল্লাদের শাণিত অস্ত্র, সভ্যতার নির্মল পুষ্পকে আহত করার পূর্বে, দর্শন ও সাহিত্যকে হত্যা করার পূর্বে, এসো বজ্র হয়ে বিদ্ধ করি তাকে।' *(পিআইডি নিবন্ধ) (লেখক : ফটোগ্রাফার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুর)*□

সকালের বাণী
Daily Sokaler Bani
বৃহস্পতিবার
২৪ অক্টোবর ২০২৪, ৮ কার্তিক ১৪৩১

পিআইডি ফিচার

বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম : উদ্যোক্তা সংস্কৃতি ও প্রযুক্তির সম্ভাবনা

আয়েশা সিদ্দিকা

> তরুণ উদ্যোক্তারা যে শুধু সাফল্য পাচ্ছে তা নয়, তারা নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখিও হচ্ছে। বেশিরভাগ তরুণদের কাছে প্রাথমিক পুঁজি বা বিনিয়োগের ব্যবস্থা নেই। ব্যাবসা শুরু করার জন্য ব্যাংক ঋণ পাওয়া এখনও সহজ নয়, বিশেষত যখন কেউ নতুন। তরুণদের মধ্যে অনেকেই পরিবার থেকে সমর্থন পায় না। কারণ এখনও আমাদের সমাজে কিছু অংশে উদ্যোক্তা হওয়াকে ঝুঁকিপূর্ণ মনে করা হয়। অন্যদিকে প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও দক্ষতার অভাবও একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশের কিছু অংশে এখনও তথ্যপ্রযুক্তির পূর্ণ সুবিধা পৌঁছেনি। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও সুযোগের অভাবে অনেক তরুণের কাছে প্রযুক্তি সম্পর্কিত ধারণা সীমিত। এই সমস্ত চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও তরুণেরা তাদের অদম্য ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে নিজেদের স্বপ্নপূরণে চেষ্টা করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম একটি অদম্য শক্তি; যাদের মেধা, উদ্ভাবনী চিন্তা ও সাহসিকতা দেশের ভবিষ্যৎ বদলে দিতে পারে। তারা এখন আর শুধু চাকরির পেছনে নয়, বরং উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের উদ্যোগ দেশের অর্থনীতিতে নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করছে এবং বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের পরিচিতি বাড়াচ্ছে। তরুণদের উদ্যোক্তা হওয়ার এই মানসিকতা আমাদের দেশের উন্নয়নে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০২২ সালের জনশুমারির তথ্য অনুযায়ী, দেশের মোট জনসংখ্যার ৩৪ দশমিক ২৬ শতাংশ তরুণ, যাদের বয়স ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। এই বিশাল যুব জনগোষ্ঠী দেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

এছাড়া, বাংলাদেশ ১৫-৬৪ বছর বয়সি জনগোষ্ঠীকে কর্মক্ষম হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যার হার সর্বাধিক ৯৪ দশমিক ৭০ শতাংশ, যা দেশের সম্ভাব্য "ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড" বা জনসংখ্যাগত সুযোগ হিসাবে দেখা হচ্ছে। এটি দেশের তরুণ প্রজন্মকে দক্ষ ও সৃজনশীল কাজে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে উন্নয়নের একটি বড়ো সম্ভাবনা সৃষ্টি করছে, বিশেষত উদ্যোক্তা সংস্কৃতির প্রসার এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে।

তরুণ উদ্যোক্তাগণ প্রযুক্তির এই যুগে প্রতিটি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশের তরুণেরা এই প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করেছে। তথ্যপ্রযুক্তির বিস্তৃতি এবং ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা তরুণদের হাতের নাগালে প্রযুক্তির সুযোগ নিয়ে এসেছে। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউবসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো শুধু বিনোদনের জন্যই নয়, বরং উদ্যোক্তা কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তরুণেরা বর্তমানে অনলাইন শপিং প্ল্যাটফর্ম, এফ-কমার্স (ফেসবুক-কমার্স), ফ্রিল্যান্সিং এবং অ্যাপ ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশাল অবদান রাখছে। ডিজিটাল মার্কেটিং, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট এবং এফ-কমার্সের মতো সেক্টরগুলোতে তরুণ প্রজন্ম সফলভাবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করছে। তরুণদের মেধা ও উদ্ভাবনী চিন্তাধারা দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনে একটি বিশাল ভূমিকা রাখছে।

বড়ো পুঁজি ছাড়াই ছোটো উদ্যোগের মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সম্ভব। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ক্ষুদ্রঋণের ধারণা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই ক্ষুদ্রঋণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করেছে। গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে অসংখ্য মানুষ নিজেদের ছোটো ব্যাবসা শুরু করে অর্থনৈতিকভাবে উন্নতির দিকে এগিয়েছে। তরুণ উদ্যোক্তারা যে শুধু সাফল্য পাচ্ছে তা নয়, তারা নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখিও হচ্ছে। বেশিরভাগ তরুণদের কাছে প্রাথমিক পুঁজি বা বিনিয়োগের ব্যবস্থা নেই। ব্যাবসা শুরু করার জন্য ব্যাংক ঋণ পাওয়া এখনও সহজ নয়, বিশেষত যখন কেউ নতুন। তরুণদের মধ্যে অনেকেই পরিবার থেকে সমর্থন পায় না। কারণ এখনও আমাদের সমাজে কিছু অংশে উদ্যোক্তা হওয়াকে ঝুঁকিপূর্ণ মনে করা হয়। অন্যদিকে প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও দক্ষতার অভাবও একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশের কিছু অংশে এখনও তথ্যপ্রযুক্তির পূর্ণ সুবিধা পৌঁছেনি। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও সুযোগের অভাবে অনেক তরুণের কাছে প্রযুক্তি সম্পর্কিত ধারণা সীমিত। এই সমস্ত চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও তরুণেরা তাদের অদম্য ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে নিজেদের স্বপ্নপূরণে চেষ্টা করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার তরুণ উদ্যোক্তাদের সহায়তায় নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। 'স্টার্টআপ বাংলাদেশ' ও 'আইডিয়া' প্রকল্পের মাধ্যমে তরুণ উদ্যোক্তারা ব্যাবসা পরিচালনা, উদ্ভাবন, ডিজিটাল প্রযুক্তি ও মার্কেটিং-এর উপর প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর উদ্যোক্তাদের প্রযুক্তি, ই-কমার্স, ফ্রিল্যান্সিং, এবং ডিজিটাল মার্কেটিং-এর মতো প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। পাশাপাশি বেসিস ও উইডেভস একাডেমি তরুণদের আইটি, ফ্রিল্যান্সিং এবং সফটওয়্যার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দিয়ে আন্তর্জাতিক পরিসরে তাদের প্রতিভা তুলে ধরার সুযোগ তৈরি করছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ৬৪ জেলা কার্যালয়ে বিভিন্ন মেয়াদি প্রশিক্ষণ শুরু করেছে। এর মধ্যে রয়েছে, গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ। এছাড়া, প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন, ফ্রিল্যান্সিং, আইটি এবং নেটওয়ার্কিং বিষয়েও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে, যা তরুণ উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করবে। সরকারের এই উদ্যোগ বেকারত্ব কমাতে এবং দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর দর্জি বিজ্ঞান, ব্লক-বাটিক, টাই-ডাই, এমব্রয়ডারি এবং অন্যান্য কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। পাশাপাশি বিউটিফিকেশন, ড্রেস মেকিং, টেইলারিং, মাশরুম ও জৈব চাষাবাদ এবং পেস্ট্রি ও বেকারি বিষয়েও প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মোট ১৯ হাজার ৭১২ জনকে বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এসব প্রশিক্ষণের ফলে মহিলারা নিজস্ব ছোটো ব্যাবসা শুরু করতে পারছে, যা তাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করছে। এই উদ্যোগ নারীদের ক্ষমতায়ন ও সমাজে তাদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে । বাংলাদেশের তরুণ ও নারী উদ্যোক্তারা দেশকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। তাদের জন্য উপর্যুক্ত প্রশিক্ষণ, আর্থিক সহায়তা এবং সুযোগ সৃষ্টি করা হলে তারা দেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বড়ো ভূমিকা রাখতে পারবে, এমনটাই প্রত্যাশা।

লেখক: সহকারী তথ্য অফিসার পদে আঞ্চলিক তথ্য অফিস রংপুর-এ কর্মরত।